অপ্রকাশিত রচনা
শুধুমাএ মন দিয়ে পড়ার জন্য

প্রসঙ্গ: সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যারহাউজ

****

[সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যারহাউজ নিয়ে আমার একটি গবেষণা করার সুযোগ হয়েছিল ২০০৪ সালের শেষের দিকে। অনেকের হয়তো মনে আছে, সেই সময়ে এই বিষয়টি নিয়ে দেশের দুটি বৃহৎ ব্যবসায়িক সংগঠন বিরোধে জড়িয়ে পড়েছিল। তাই এই বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারের নীতি কৌশল কি হওয়া উচিত, তা দেখার জন্য এই গবেষণাটি করা হয়েছিল।

আমি পরবর্তীতে গবেষণা পেপারটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নাল অফ বিজনেস স্টাডিজে প্রকাশের জন্য পাঠাই। দুইজন রিভিয়্যুার এই পেপারটি পড়ে তা প্রকাশের পক্ষে মত দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই পেপারটি সেখানে আর প্রকাশিত হয়নি।

২০০৫ সালে বিদেশে বসে এই গবেষণা নিয়ে আমি এই রচনাটি লেখি। আমার ইচ্ছা ছিল এই রচনাটি দেশের একটি সাপ্তাহিকে পাঠানোর। কিন্তু পরে তা আর হয়ে ওঠেনি।

এই গবেষণাটির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এই গবেষণাটি করা হয়েছিল এমন একটি সময়ে যখন ২০০৫ সাল পরবর্তী কোটামুক্ত বিশ্ববাণিজ্য ব্যবস্থায় বাংলাদেশের টেক্সটাইল এবং গার্মেন্টস খাতের কি অবস্থা হবে, তা নিয়ে কেউই নিশ্চিত করে কিছু বলতে পারছিলেন না। এমনই এক অবস্থায় আমি এই গবেষণাটিতে বাংলাদেশের গার্মেন্টস এবং টেক্সটাইল খাত নিয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করি।

আমার অবস্থান ছিল সরকার যদি সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যারহাউস প্রতিষ্ঠা করার অনুমতি না দেয়, তাহলে তাতে কোটামুক্ত বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থায় দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের ক্ষতি হবে। তাই আমার অবস্থান ছিল সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যারহাউজ প্রতিষ্ঠার পক্ষে। আমার যতটুকু মনে আছে দেশের শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদরাও প্রকাশ্যে না বললেও সরকারের বিভিন্ন কমিটিতে এই ওয়্যারহাউজ নির্মাণের পক্ষে তাদের মতামত ব্যক্ত করেছিলেন।

কিন্তু তৎকালীন অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমান এর নের্তৃত্বে কেবিনেট কমিটি এই ধরণের পরামর্শের বিরোধীতা করে এবং এর ফলে সরকার ব্যবসায়ীদেরকে আর সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যারহাউজ প্রতিষ্ঠা করার অনুমতি দেয়নি।

সরকারের এই সিদ্ধান্তে স্বভাবতই আমার মনে হতে থাকে সরকার ভুল করছে।

আমার এই বিশ্বাস আরো দৃঢ় হতে থাকে যখন আমার ভবিষ্যদ্বাণীগুলি একে একে ফলতে শুরু করে করে ২০০৫ সালে কোটা উঠে যাওয়ার পর। তাই আমি আনন্দিত হয়ে এই রচনাটি লিখে ফেলি এবং পত্রিকাতে পাঠানোর প্রস্তুতি নেই। কিন্তু সিদ্ধান্ত নেই রচনাটি পাঠানোর আগে বরং আরো কিছুদিন অপেক্ষা করে দেখা যাক।

কিন্তু আরো কিছুদিন যেতে না যেতেই আমাকে অবাক করে দিয়ে দেশের পোষাক খাতে বিপরীতমুখী প্রবণতা দেখা দেয়। আমি যে ভবিষ্যদ্বাণীগুলি করেছিলাম তা ধীরে ধীরে বদলাতে শুরু করে। প্রমাণিত হতে থাকে সরকারের অবস্থানই আসলে সঠিক। তাই আমি আর তখন এই রচনাটি কোন পত্রিকাতে পাঠাইনি।

পাঠকদের জন্য আজ আমি এই রচনাটি এবং সেই সাথে অপ্রকাশিত গবেষণা পেপারটি আইএফডি'র ওয়েবসাইটে আপলোড করছি।

এই রচনাটিতে পোষাক খাতের কাঠামোগত কিছু বিষয় নিয়ে বেশ কিছু মন্তব্য করা হয়েছে যা ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণে সহায়ক হতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। পাঠকরা লক্ষ্য করবেন রচনাটির শেষে বর্তমান গার্মেন্টস খাতের নৈরাজ্যের অন্তত একটি কারণ উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য, ২০০৫ সালের পর এই অপ্রকাশিত রচনাতে একমাত্র বানান রীতি ছাড়া আর কোন কিছুতে আমি কোন প্রকার পরিবর্তন করিনি।]

****

সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যারহাউজ (সিবিওয়্যার) নিয়ে গার্মেন্টস মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ এবং টেক্সটাইল মালিকদের সংগঠন বিটিএমএ বিবাদে জড়িয়ে পড়ে ২০০৪ সালের মাঝামাঝিতে। বিজিএমইএ দীর্ঘদিন থেকে সরকারের কাছে সিবিওয়্যারকে অনুমোদন দেয়ার সুপারিশ করে আসছিল। আর বিটিএমএ সঙ্গত কারণেই সবসময়ই বিষয়টির বিরোধীতা করে এসেছে।

এই দুই সংগঠনের বিবাদ নিরসনে সিবিওয়্যার নিয়ে সরকারের অবস্থান কি হওয়া উচিত, তা ঠিক করার জন্য সরকার একটি কমিটি গঠন করে। অনেক আলোচনার পর কমিটির সদস্যরা সিবিওয়্যার অনুমোদনের পক্ষে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন।

তবে কমিটির এই সুপারিশে কোন কাজ হয়নি। সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে সরকার সিবিওয়্যার অনুমোদন না দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ২০০৪ এর অক্টোবর ৩০ তারিখে।

সেই সময়ে সিবিওয়্যার নিয়ে নীতিনির্ধারক এবং ব্যবসায়ী মহলের বাইরে খুব একটা কথা বার্তা শোনা যায়নি। এর মূল কারণ, সেই সময়ে ২০০৫ পরবর্তী কোটামুক্ত বিশ্ব ব্যবস্থায় বাংলাদেশের গার্মেন্টস খাত এবং টেক্সটাইল খাতের কি অবস্থা হবে, তা নিয়ে সকলেই কমবেশি অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিলেন। তাই নতুন এই বিষয়টি নিয়ে কথাবার্তা বলে কেউই তাদের ঝুঁকি বাড়াতে চাননি।

এছাড়াও এটাও বলে রাখা দরকার, এ বিষয়টি নিয়ে তথাকথিত *নিরপেক্ষতার* কোন সুযোগ সেসময় ছিল না। এ ধরণের একটি বিষয়ে গবেষককে গার্মেন্টস মালিক বা টেক্সটাইল মালিক – এই দু'দলের যে কোন এক দলের পক্ষ নিতেই হবে। এর থেকে পরিএাণ পাবার কোন উপায়ই নেই।

তথাকথিত *নিরপেক্ষ* অবস্থানের সবচেয়ে বড় সুবিধা হল, এতে সবসময় একটি পালাবার পথ খোলা রাখা যায়। ভবিষ্যতে বিপদে পড়লে বলা যায়, *আমিতো আগেই বলেছি*!

কিন্তু এ ধরণের ভাওতাবাজির সুযোগ সিবিওয়্যার নিয়ে সম্ভব ছিল না।

এতো প্রতিবন্ধকতা এবং তথ্যের অভাবের মাঝেও সিবিওয়্যার নিয়ে সেই সময়ে অনেকটা সবার অলক্ষ্যেই একটি গবেষণা পরিচালিত হয়েছিল। আজকের রচনার মূল উদ্দেশ্যই হল, পাঠকদেরকে সহজ ভাষায় এই গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলগুলি জানানো।

তবে, সবার আগে যাদের সিবিওয়্যার নিয়ে ভালো ধারণা নেই, তাদের জন্য বিষয়টি সম্পর্কে একটু ব্যাখ্যা করা দরকার।

সিবিওয়্যার কি?

গার্মেন্টস মালিকরা যখন তাদের পোষাক তৈরির অর্ডার পান, তখন তারা এই পোষাক বানানোর জন্য শুল্কমুক্ত কাপড় বা ফ্যাব্রিক্স বিদেশ থেকে আমদানি করেন। এ জন্য পোষাকের অর্ডার পাওয়ার পর, কাপড় আমদানি করে, পোষাক বানিয়ে, তা পাঠাতে তাদেরকে অতিরিক্ত সময় ব্যয় করতে হয়। অর্থনৈতিক পরিভাষায় এই পুরো সময়টিকে বলে *লিড টাইম* (Lead Time)।

তাই বাংলাদেশের গার্মেন্টস মালিকরা সবসময়ই চাচ্ছিলেন এমন একটি ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে তৃতীয় কোন পক্ষ আগেভাগেই তাদের জন্য ফেব্রিক্স আমদানি করে রাখবে, যাতে তারা অর্ডার পাওয়া মাএই পোষাক বানিয়ে বিদেশে পাঠিয়ে দিতে পারেন। এর ফলে তারা বিদেশী পোষাক ক্রেতাদেরকে তাড়াতাড়ি পণ্য পাঠিয়ে দিতে পেরে অন্যান্য দেশগুলির চেয়ে প্রতিযোগিতায় এগিয়ে থাকবেন।

তাদের দাবী মতে, তৃতীয় পক্ষটি বা সিবিওয়্যার অপারেটর সরকারের অনুমোদন নিয়ে সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যারহাউজ বা সিবিওয়্যার গঠন করবে। এরপর এর লাইসেন্স ব্যবহার করে ফেব্রিক্স, সুতা, মেশিনারিজ, এবং গার্মেন্টস ও টেক্সটাইল শিল্পের জন্য অন্যান্য যে সকল কাঁচামাল আছে, তা শুল্কমুক্তভাবে আমদানি করে সিবিওয়্যারে আগেভাগেই জমা করবে। আর প্রয়োজনমত এই পণ্যগুলির ক্রেতা হবেন শুধুমাএ রপ্তানিমুখী শিল্প মালিকরাই। সিবিওয়্যার অপারেটররা স্থানীয় বাজারে তাদের পণ্য বিক্রি করতে পারবেন না।

বিজিএমইএ বনাম বিটিএমএ

সিবিওয়্যার বাস্তবায়িত হলে গার্মেন্টস মালিকরা যে অনেক সুবিধা পাবেন, এটি পরিষ্কার। ২০০৪ এর হিসাব অনুযায়ী গার্মেন্টস মালিকদের লিড টাইম ছিল প্রায় ৯০ দিন। কিন্তু সিবিওয়্যার হয়ে গেলে তা কমে আসবে ৪৫ দিনে।

কিন্তু এর ফলে বিপদে পড়বেন টেক্সটাইল মালিকরা। তারা যে সকল ফেব্রিক্স দেশে তৈরি করছেন, তা আর গার্মেন্টস মালিকরা ব্যবহার করবেন না। লিড টাইম বেশি থাকার জন্য অনেক গার্মেন্টস মালিকই বর্তমানে দেশি ফেব্রিক্সকে প্রাধান্য দেন। কিন্তু সিবিওয়্যার হয়ে গেলে টেক্সটাইল মালিকদের এই সুবিধা আর থাকবে না।

এই কারণে বিটিএমএ সিবিওয়্যার অনুমোদনের বিপক্ষে সেসময় জোড়ালো অবস্থান নেয়। তারা যুক্তি দেয়, সিবিওয়্যার হলে এর অপারেটররা অবৈধভাবে কাপড় এবং সুতা স্থানীয়

বাজারে বিক্রি করে ফেলবে। ফলে দেশের ক্রমবর্ধমান ফেব্রিক্স এবং স্পিনিং খাত পড়বে সংকটে । তাদের যুক্তিমতে ২০০৫ এর কোটামুক্ত বিশ্ববাণিজ্য ব্যবস্থার মোকাবেলায় যেখানে গার্মেন্টস খাতের ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ শিল্প স্থাপন করা জরুরি, তখন এই ধরণের একটি পদক্ষেপ হবে অনেকটা আত্মহত্যার শামিল।

এছাড়াও তারা যুক্তি দিয়েছিলেন, দেশে যখন উন্নতমানের ফেব্রিক্স এবং সুতা তৈরি হচ্ছে, তখন বিদেশী পণ্যের শুল্কমুক্ত আমদানী করার সুযোগ দেয়ার কোন মানে নেই।

এর বিপরীতে গার্মেন্টস মালিকরা বলছিলেন, বাংলাদেশে তৈরি ফেব্রিক্স এবং সুতা নিম্নমানের এবং দামেও বেশি। এর ফলে দীর্ঘমেয়াদে গার্মেন্টস খাতের রপ্তানি ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

কে সঠিক?

গার্মেন্টস মালিক এবং টেক্সটাইল মালিকদের যুক্তি, পাল্টা যুক্তি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, গার্মেন্টস মালিকদের যুক্তি অনেক বেশি শক্তিশালী।

টেক্সটাইল মালিকরা অবৈধভাবে কাপড় বিক্রি করে দেয়াকে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধকতা হিসাবে উল্লেখ করেছেন। অথচ কাস্টমস এক্টেই এ ধরণের অবৈধ বিক্রয় বন্ধ করার যথাযথ ব্যবস্থা আছে।

দুর্নীতির কারণে হয়তো এই আইন বাস্তবায়িত হচ্ছেনা, কিন্তু তার মানে এই নয়, এই আইন কখনোই বাস্তবায়ন করা যাবে না। যে সরকার র‍্যাবের মাধ্যমে সন্ত্রাসী গুলি করে মেরে ফেলছে, সেই সরকার কাস্টমসকে টাইট দিয়ে কাপড় চুরি ঠেকাতে পারবে না, তা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

উন্নতমানের ফেব্রিক্স তৈরির যে দাবী টেক্সটাইল মালিকরা করেছেন, তা মূলত তাদের যৌক্তিক অবস্থানকেই দুর্বল করেছে। তাদের কাপড় যদি এতোই উন্নতমানের হয়, তাহলে তারা বিদেশী কাপড় আমদানিকে এতো ভয় পাচ্ছেন কেন? এই বিষয়টি তারা পরিষ্কার করেননি।

এখানে মূলত তারা পড়েছিলেন এক উভয় সঙ্কটে। তারা যদি সত্য স্বীকার করে বলতেন, তাদের কাপড় উন্নতমানের নয়, তাহলে তা গার্মেন্টস মালিকদের পক্ষে যেত। ফলে সরকার

বাধ্য হতো সিবিওয়্যারের অনুমোদন দিতে। কিন্তু তাদের অবস্থান রক্ষা করার জন্য বিদেশী পণ্যের সাথে তাদের পণ্য প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকতে পারবে কিনা, সেই বিষয়ে তারা কোন কথা বলেন নি।

তাই সিবিওয়্যার হলে বিদেশী পণ্যের প্রতিযোগিতার মুখে বাংলাদেশি ফ্রেব্রিক্স এবং সুতা খাত কতটুকু ধকল সহ্য করতে পারবে – এই বিষয়টি যাচাই করা ছিল সেসময়ের গবেষণাটির অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ।

টেক্সটাইল খাতের কম্পেটিটিভনেস

টেক্সটাইল এবং স্পিনিং খাতের কম্পেটিটিভনেস (Competitiveness) বা প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা যাচাই করতে গিয়ে দেখা যায়, বাংলাদেশে বিগত কয়েক বছরে ফেব্রিক্স খাতের ধকল সইবার ক্ষমতা বেড়েছে, তবে নিট ফেব্রিক্স এবং ওভেন ফেব্রিক্স খাতের কম্পেটিটিভনেসের মধ্যে তারতম্য রয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, ওভেন ফেব্রিক্স খাতের তুলনায় নিট ফেব্রিক্স খাতের প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা অনেক বেশি।

আবার সুতা খাতের তথ্য উপাও পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, কটন সুতার প্রতিযোগিতা করার ক্ষমতা মিশ্র। অর্থাৎ বিদেশী সুতার সাথে বাংলাদেশের সুতা প্রতিযোগিতায় কতটুকু টিকে থাকতে পারবে, তা পরিষ্কার নয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে কটন সুতা খাতকে সরকার বিভিন্নভাবে বিশেষ ইন্সেন্টিভ দিয়ে সাহায্য করে যাচ্ছে।

অতএব এই পরিপ্রেক্ষিতে সিবিওয়্যার অনুমোদন হলে তা নিট ফেব্রিক্স খাতকে কোন প্রকার ঝুঁকির মধ্যে ফেলবে না। কিন্তু সমস্যার মধ্যে পড়বে ওভেন ফেব্রিক্স খাত এবং কটন সুতা খাত।

চারটি ভবিষ্যদ্বাণী

উপরের বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে সিবিওয়্যার না হলে বাংলাদেশে কি কি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হবে, সেই ব্যাপারে গবেষণাটিতে চারটি সুনির্দিষ্ট আগাম ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। সেগুলি হল:

(১) উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ওভেন গার্মেন্টস বেশি লিড টাইমের জন্য টিকতে না পেরে ব্যবসা হারাবে। টিকে থাকবে শুধু তারাই যাদের নিজস্ব ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ সাপোর্ট আছে।

(২) সিবিওয়্যার না থাকাতে নীট গার্মেন্টস খাত খুব একটা ক্ষতিগ্রস্থ হবেনা, কারণ দেশেই পর্যাপ্ত পরিমাণ নীট ফেব্রিক্স এবং সুতা তৈরি হচ্ছে। ফলে, তাদের প্রবৃদ্ধি অপরিবর্তিত থাকবে। এই পরিস্থিতি অব্যাহত থাকলে বাংলাদেশ ক্রমেই নীট ওয়্যার খাতের দিকে ঝুঁকে পড়বে।

(৩) নীট ফেব্রিক্স এবং ওভেন ফেব্রিক্স খাতে বিনিয়োগ বাড়বে, তবে নীট খাতে বিনিয়োগ হবে অনেক বেশি। কারণ দেশে ওভেন ফেব্রিক্সের বাজার সংকুচিত হয়ে পড়বে। এছাড়াও নীট ফেব্রিক্স তৈরিতে ঝামেলাও কম। তাই বিনিয়োগকারীরা সহজ এবং নিরাপদ লাভের আশায় নীট ফেব্রিক্স খাতে বিনিয়োগে ঝাপিয়ে পড়বেন।

(৪) সুতা খাতের চাহিদা বেড়ে যাওয়াতে এই খাতে বিনিয়োগ বাড়বে্। এর সাথে সাথে সুতার মুল্যও বৃদ্ধি পাবে। কারণ স্থানীয় বাজারে সুতামিলগুলি একচেটিয়া আধিপত্য লাভ করবে। ফলে দীর্ঘমেয়াদে সমগ্র টেক্সটাইল এবং গার্মেন্টস খাতের উপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়বে।

এখানে বলা দরকার এই ভবিষ্যদ্বাণীগুলি করা হয়েছিল ২০০৪ সালে কোটামুক্ত বিশ্বব্যাবস্থা হওয়ার আগে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, বিগত এক বছরের তথ্য উপাও ঘেটে দেখা গেছে উপরের কিছু কিছু ভবিষ্যদ্বাণী এখন ফলতে শুরু করেছে।

এটা নিশ্চয়ই সবার মনে আছে একই সময়ে বাংলাদেশের গার্মেন্টস খাতের ভবিষ্যৎ নিয়ে আইএমএফ বেশকিছু আগাম কথা বলেছিল। কিন্তু তার কিছুই পরে ফলেনি।

২০০৫ সালের এখন পর্যন্ত তথ্য উপাও অনুযায়ী বাংলাদেশের নীটওয়্যার খাতে রপ্তানি উল্লেখযোগ্য হারে বাড়ছে, কিন্তু সেই অনুপাতে ওভেন গার্মেন্টস খাতের রপ্তানি প্রবৃদ্ধির গতি কম।

দেশে বিগত এক বছরে অনেক নতুন টেক্সটাইল শিল্প স্থাপিত হয়েছে, তবে তা মুলত হয়েছে নীট ফেব্রিক্স খাতে। ওভেন ফেব্রিক্স খাতে ততোটা বিনিয়োগ হয়নি।

আর কটন সুতার মূল্য বাড়ার কারণে নীট ওয়্যার মালিক এবং টেক্সটাইল মালিকদের মধ্যে বিতর্ক হয়েছে। পরে সরকার বেনাপোল দিয়ে সুতা আমদানির অনুমতি দেয়াতে এই বিবাদের আপাত অবসান হয়েছে।

শাখের করাত

সিবিওয়্যার বাংলাদেশের জন্য একটি শাখের করাত। এটি হলেও ক্ষতি, না হলেও ক্ষতি। তবে হলে ক্ষতির পরিমাণ কম। এই পরিমাণ অঙ্কের হিসাবে বের করা খুব জটিল।

সিবিওয়্যার হলে ওভেন গার্মেন্টস খাত নীট খাতের মতো একই গতিতে বাড়বে বলে আশা করা যায়। ফলে দেশে ওভেন ফেব্রিক্স খাতের স্থানীয় বাজার বড় হবে। তাই সরকারি সহায়তা একটু বাড়িয়ে দিলে বিনিয়োগকারীরা এই খাতে বিনিয়োগে উৎসাহিত হবেন।

পক্ষান্তরে, সিবিওয়্যার কটন সুতা খাতকে ক্ষতিগ্রস্থ করবে। কিন্তু একথা খেয়াল রাখা উচিত, বাংলাদেশে সরকারকে হয়তো আজীবনই সুতা খাতকে নগদ সহায়তা এবং প্রটেকশন দিয়ে যেতে হবে। কারণ বাংলাদেশ তুলা উৎপাদন করে না। তাই ইন্ডিয়া কিংবা পাকিস্তানের সাথে বাংলাদেশ কখনই পেরে উঠবে না।

অতএব, সরকার যদি সিবিওয়্যারকে অনুমোদন দেয় এবং সেই সাথে সুতা খাতে নগদ সহায়তা অব্যাহত রাখে এবং স্থল বন্দর দিয়ে সুতা আমদানি বন্ধ রাখে, তাহলে সুতা মালিকরা যেমন আরো বিনিয়োগে উৎসাহিত হবেন তেমনি তারা কোন অতিরিক্ত লাভও করতে পারবেন না। ফলে লাভবান হবে সমগ্র গার্মেন্টস এবং টেক্সটাইল শিল্প।

সরকার আশা করেছিল, সিবিওয়্যার না হলে ফেব্রিক্স এবং সুতা খাতে বিনিয়োগ বাড়বে। আর স্থানীয় প্রতিযোগিতা বেড়ে যাওয়ার কারণে সুতা এবং কাপড়ের গুণগত মান বাড়বে এবং দাম কমে আসবে। কিন্তু, বাস্তবে তা হচ্ছেনা। বিনিয়োগ বাড়ছে শুধু নীট ফেব্রিক্স খাতে এবং নতুন সুতার মিল চালু হলেও সুতা মালিকরা তাদের দাম কমাননি।

বেনাপোল দিয়ে সম্প্রতি সুতা আমদানির সুযোগ দেয়াতে সুতা মালিকরা দীর্ঘমেয়াদে ক্ষতিগ্রস্থ হবেন। নতুন যে সকল বিনিয়োগকারী সুতা খাতে বিনিয়োগ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, তারাও পিছিয়ে যাবেন। ফলে দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের গার্মেন্টস খাত পরনির্ভরশীল হয়ে পড়বে।

অথচ এই সমস্যা কাটানো যেত সিবিওয়্যারকে অনুমোদন দিয়ে। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, সিবিওয়্যারের মাধ্যমে পণ্য শুল্কমুক্তভাবে আমদানি করা গেলেও, তা মূলত শুল্কমুক্ত থাকছে না। কারণ এই পণ্যমূল্যের সাথে সিবিওয়্যার অপারেটর তার নিজের লাভকেও যোগ করবে।

পণ্য আমদানির জন্য ব্যাংকের সুদ, সিবিওয়্যার চালানোর খরচ ইত্যাদি বিবেচনায় আনলে এই শতকরা লাভের পরিমাণ যে একেবারে কম হবে না, তা অনেকেই স্বীকার করবেন। তাই সিবিওয়্যারকে যতোটুকু বিভীষিকা মনে করা হচ্ছে, আসলে তা ততোটা আতঙ্কের বস্তু নয়।

শেষ কথা

বাংলাদেশের গার্মেন্টস শিল্পে নীটখাতের প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে ওভেন খাতের প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য সিবিওয়্যারের কোন বিকল্প নেই।

বিদেশে নীটওয়্যারের চাহিদা মূলত নিম্ন এবং নিম্ন মধ্যবিও শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। অন্যদিকে ওভেন ওয়্যারের মার্কেট মূলত মধ্যবিও এবং উচ্চবিও শ্রেণী। এদের অনেকেই আবার আন্তর্জাতিক বিনিয়োগকারী।

তাই একটি দামী শার্টে *মেড ইন বাংলাদেশ* লেখা দেখে অনেক বিনিয়োগকারীর মনে বাংলাদেশ সম্পর্কে একটি ইতিবাচক ধারণার সৃষ্টি হবে। ফলে তারা তাদের নোটবুকে ভবিষ্যত সম্ভাব্য বিনিয়োগের স্থান হিসাবে বাংলাদেশের নামটিও টুকে রাখবেন।

নীট গার্মেন্টস তৈরির সম্ভাবনা খরচ বা অপরচুনিটি কস্ট-ও (Opportunity Cost) অনেক বেশি। যে শ্রমিক, জমি, বিদ্যুৎ, গ্যাস, এবং সময় ব্যয় করে আমরা একটি পাঁচ ডলার মূল্যের টিশার্ট বানাচ্ছি, সেই একই উপাদানের মিশ্রণ দিয়ে আমরা বানাতে পারতাম একটি বিশ ডলার মূল্যের শার্ট বা প্যান্ট। ফলে একই সময়ে বাংলাদেশ পেত অনেক বেশি বৈদেশিক মুদ্রা।

তবে ওভেন খাত বিকশিত না হওয়াতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে গার্মেন্টস শ্রমিকদের। নীট খাতে শ্রমিকদেরকে সহজেই শিখিয়ে নেয়া যায়। কিন্তু ওভেন খাতে তা সম্ভব নয়। তাই ওভেন খাতের শ্রমিকদের মালিকদের সাথে দেন দরবার করার ক্ষমতা অনেক বেশি।

এছাড়াও ওভেন গার্মেন্টস খাতে দক্ষ হয়ে গেলে বিদেশে শ্রমিক রপ্তানিরও অনেক সুযোগ আসবে যার মাধ্যমে শ্রমিকরা বর্ধিত আয় পেতে পারবেন। কিন্তু নীট খাতে এই সম্ভাবনা অনেক কম।

নীটওয়্যার খাতের প্রবৃদ্ধি যে হারে হচ্ছে, এতে সকলেই আনন্দিত। তবে এই প্রবৃদ্ধি যদি হয় অন্য কোন খাতের প্রবৃদ্ধির বদলে, তাহলে এতে আতঙ্কিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ

রয়েছে। এই উচ্চ প্রবৃদ্ধি আগামীতে বজায় থাকলে ভবিষ্যতে সহজ এবং নিরাপদ লাভের আশায় এই খাতে অন্য খাত হতে পুঁজির স্থানান্তর ঘটবে। ফলে মুখ থুবড়ে পড়বে রপ্তানি বহুমুখী কার্যক্রম।

আর এভাবেই সরকারের একটিমাএ সিদ্ধান্তের কারণে সবার অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যাচ্ছে রপ্তানি খাত। আস্তে আস্তে আমরা পরিণত হচ্ছি শুধুমাএ গেঞ্জি এবং জাঙ্গিয়া বানানো জাতিতে।

[ভুল সংশোধনঃ সরকার সিবিওয়্যার অনুমোদন না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ২০০৪ সালের আগস্ট ১৬ তারিখে – লেখক (আগস্ট ২০১০)]